# ‘মামা সৈয়দবংশ..... চুরি করমু’

দিলরুবা শাহানা

কিংবদন্তীতুল্য যার জনপ্রিয়তা সেই লেখক হুমায়ূন আহ্মেদের এক নাটকে(সম্ভবতঃ ‘বহুব্রীহি’) গৃহ থেকে বিতাড়িত গৃহভৃত্য কাদের নামের চরিত্রটিকে যখন রিক্সা চালানোর কথা বলা হয় তখন সে বলে
‘মামা সৈয়দবংশ রিক্শা চালামু মাইনষে দেইখ্খা ফালাইবো না!’
মামার প্রশ্ন ‘তো কি করবি?’
‘চুরি করমু’।
শুধুমাত্র অর্থহীন বংশগরিমা রক্ষায় রিক্শা চালানোর চেয়ে চুরি করাকে শ্রেয় মনে করছে কেউ আর কেউ সংস্কৃতজাত মানসিক দ্বিধায় সামান্য কাজ করাকে অবজ্ঞা করছে, ভীতচোখে দেখছে।

সুস্মি(সুসমা) এইদেশে এসেছে দশ সপ্তাহ হয়নি। এরই মাঝে ট্রেনে চড়ে অফিস যাওয়ায় অভ্যস্ত হচ্ছে। দুবাইতে সুস্মির বাচ্চা রাখার লোক ছিল যাকে গভর্নেস বলা যায়। তার কাছে নিশ্চিন্তে বাচ্চা রেখে গাড়ীতে চড়ে অফিসে যেতো। ইন্ডিয়াতে ট্রামেবাসে কখনো বা রিক্শাতে চড়ে কলেজ ও ইউনিতে গেছে। আর এইদেশে গভর্নেসতো দূরের কথা আয়াও নাই! আর থাকলেও তা সাধ্যের বাইরে। শহরে গাড়ী নিয়ে আসাও মুশকিল। কারণ গাড়ীর পার্কিং সীমিত। তাই ভোরবেলাই বাচ্চাসহ ট্রেন ধরা। বাচ্চাকে ডে কেয়ারে নামিয়ে দিয়ে তবে অফিসে পৌছানো। তাই প্রতিদিন কিছুটা সময় হাতে নিয়ে বের হতে হয়। মিনিট দশেক সময় ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে মানুষের যাতায়াত দেখে আর ভাবে। কত কি ভাবে। জীবন কোথাও চূড়ান্ত নিশ্চিত নয়- এই অমোঘ সত্য ধরা দেয় চেতনায়।

আজ দেখে এক মহিলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হাতে এক প্যাকেট চকোলেট। যে যাচ্ছে তাকে একটা করে চকোলেট দিচ্ছে। সুস্মি ভীড় কমলে মহিলার কাছে গিয়ে জানতে চাইলো কিসের জন্য চকোলেট বিলানো হচ্ছে। মহিলা চোখে পানি নিয়ে বললো তার ছেলে আজ ফিস এন্ড চিপসের দোকানে কাজ শুরু করেছে সেই আনন্দে সে চকোলেট বিলাচ্ছে। ছেলের বয়স কত জানতে চেয়ে সুস্মি অবাক। সতেরো বছরের ছেলে এখনই আগুনের কাছে রান্নাবান্নার কাজ করতে যাবে সেই আনন্দে মা অপরিচিত মানুষকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে! এ কোন আজব দেশে এসে পড়লো!

সুস্মি প্রামে বসা ছেলে কৃষের দিকে তাকালো। মনে মনে প্রার্থনা করলো তার ছেলেকে যেন কোনদিন ফিস এন্ড চিপ্সের দোকানে কাজ করতে না হয়। তার আদরের কৃষ্ণ এখানে হয়ে গেছে কৃষ। এদেশে ক্রিষ্টোফারকে সংক্ষেপে ক্রিস বলে। কৃষ বা কৃষ্ণের জীবন যেন তার চেয়ে ভাল, মসৃন হয় সেই আশাতেইতো এইদেশে আসা। দুবাইতে আন্তর্জাতিক ব্যাংকে ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট হিসাবে ভাল চাকুরী ছিল তার, স্বামীও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার।

অষ্ট্রেলিয়াতে রেসিডেন্সীর জন্য চেষ্টার সাথে সাথে চাকরীর জন্যও বিভিন্ন সংস্থায় আবেদন পাঠিয়েছিল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই দুটোই এক সাথে হয়ে গেল। অর্থবিত্ত তাদের যথেষ্ঠ আছে। তবুও আসার পর থেকে বারবার মনে হচ্ছে শুধু অর্থ থাকলেই ইন্ডিয়া বা দুবাইয়ের মতো সাচ্ছন্দ্য এখানে মেলে না। আজকের এই ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তুললো খুব।

দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার সময় বাংলাদেশের সহকর্মী রায়া আলীকে ঘটনাটা বলে সুস্মি। সে বয়সে সুস্মীর চেয়ে বড়, তার স্কুল কলেজে পড়ুয়া সন্তানও রয়েছে। মাঝারি লম্বার চিকন গড়নের নম্র গম্ভীর মহিলাকে ভাবুক মনে হয়। সুস্মীর মন জানতে চাইলো তার মত ভাবনা কি একেও দোলা দিয়ে গেছে কখনো! সব শুনে সুস্মীকে রায়া আশ্বস্ত করে। বলে যে এই দেশে নিয়মই হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই বাচ্চারা কিছু কিছু কাজ করে বড় হয়। এদের মতে দায়িত্বশীল হয়ে বড় হওয়ার জন্য কাজ করাটা দরকার। সব শুনে সুস্মীর বিস্মিত প্রশ্ন-
'ছোটবেলা মানে কত ছোট?'
'এই যেমন ইয়ার টেন বা গ্রেড টেন-এ পড়ার সময়ে স্কুলের পাঠের অংশ হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স অর্জন করা'।
'তোমার বাচ্চারাও কি করেছিল?'

রায়া নিজের অভিজ্ঞতা তখন বর্ণনা করে।
তারও আছে দুই ছেলে। বড়জন ইয়ার টেনে থাকার সময়ে এক ইলেকট্রোনিক্সের দোকানে কাজ করেছিল দশদিন। পয়সাও পেয়েছিল সামান্য। ইয়ার ইলেভেনে পড়ার সময়ে এক ছুটির দিনে সকালে নাশতার টেবিলে ঘোষণা করলো-
'আমি উইকএন্ডে কয়েক ঘন্টা কাজ করবো। দেখি কি কাজ পাই'।
রায়া ও তার স্বামী আঁতকে উঠলো ছেলের কথা শুনে। তাদের আয় উপার্জন ভাল। ছেলেদের চাহিদাও মিটিয়ে যায় দরাজ হাতে। দুই ছেলের জন্য এডুকেশন ইন্সুরেন্স বা শিক্ষাবীমার জন্য প্রতিমাসে মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছে। আর ছেলে চায় কাজ করতে! ওর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়নিতো? নাকি বাজে সঙ্গীসাথী জুটেছে তাই বাড়ী ছাড়ার মতলব করেছে? ভয় হল তাদের। তবে অবস্থা দেখেতো সেরকম কিছু মনে হয় না । কোন রকম মাথার গন্ডগোল বা মনের অস্থিরতা তো বোঝা যায় না। পড়াশোনা করছে আগের মতই, বিতর্ক-বক্তৃতা, ক্রিকেট-বাস্কেটবল সবই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কাজের জন্য উতলা কেন হঠাৎ। কারণ জানতে চাইলো ওরা। বললো পয়সা লাগলে আরও পয়সা দেবে ওরা। তাও এই বয়সে কাজের চিন্তা ছাড়ুক।

ছেলে বলেছিল- 'আহ্ হা, পয়সার জন্য না। বন্ধুরা সবাই কাজ করছে সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা হলেও, আর এইদেশে বড় ডিগ্রী থাকলেই চট্ করে চাকরীতে নেয় না যদি আগের অভিজ্ঞতা না থাকে। জানো অষ্ট্রেলিয়ার একসময়ের লেবার দলের নেতা ও মিনিষ্টার কিম বিজলী স্কুলে থাকার সময়ে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন কবর খুড়নেওয়ালা হিসাবে। বাকীরাও কোন না কোন কাজ করেছেই।'

তারপরও ছেলের কাজের বিষয়ে মা-বাবার অনীহা দেখে সে বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বলছিল 'ঠিক আছে, তবে ইউনি শেষ করলে তোমরাই আমাকে চাকরী খুঁজে দিও।'
সুস্মী গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইলো।
'তারপর কি হল'?
ছেলে ভালভাবে পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো। এখন চাকরী নয়- কয়েকঘন্টার ছোটখাটো কাজ পাওয়াও হয়ে দাঁড়ালো মহা মুশকিল। ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি ইস্কুলের বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করায়। যারা স্কুলে পড়ার সময়ে ঢুকেছিল কাজ করতে, ইউনি শুরু করলেও ওই একই পারিশ্রমিকে তাদের দিয়ে কাজ করানো যায় বলে এদের বিদায় করে না। তবে সরাসরি ইউনি পড়ুয়াকে নিতে চায় না বয়স আঠারোর বছরের বেশী বলে। এ সময়ে মজুরী বেশি দিতে হয়।
'তখন বুঝলাম ছেলের বাস্তবজ্ঞান আমাদের চেয়েও বেশী, সাধে কি বলেছিল ছোটখাটো কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে পেশা অনুযায়ী কাজ জোটানো সহজ নয়। তারপরে ও অনেক খুঁজাখুজি করে ইন্ডিয়ান এক রেষ্টুরেন্টে শনিবার সন্ধ্যায়

চার ঘন্টার কাজ জোগার করেছে। অথচ স্কুলে থাকার সময়ে ঐ ইলেকট্রোনিক্সের দোকানে চাইলেই কাজ করতে পারতো।'

সুস্মী বললো-
'ধরো কারোর প্রয়োজন নাই ছুটকা কাজের; তবে সে কেন করবে?'
'তার হয়তো দরকার নাই; তবে একসময়ে ওকে যারা বড় কাজে মানে পেশাগত কাজে নিয়োগ দেবে তারা দেখতে চাইবে পরিবারের বাইরেও বৃহৎ সমাজে, ভিন্ন পরিসরে নানা ধরনের, নানা স্বভাবের মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতা বা ধৈর্য ওর অর্জিত হয়েছে কিনা। ঐ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে পিপল্‌স্কিল, টিমওয়ার্ক এবিলিটি এসব গড়ে উঠে, বুঝলে?'

'জানো, তবুও আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে স্কুলে পড়ার সময়েই আমার ছেলেকে কাজ করতে হবে, তাছাড়া আমারতো পয়সার দরকার নাই।'

কথাটা বলে কেমন উদাস হয়ে গেল সুস্মী। রায়া আলী ভিনদেশের ভিন আচরণে ভাবনা কাতর সুস্মীর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলে
'শোন, কাজ করা ভাল। বাচ্চারা শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে, দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। ঐদিন অপরা উইনফ্রের অনুষ্ঠানে দেখালো ওয়ারেন বাফেটের নাতনী নিকোল বাফেট পড়ছে আর পাশাপাশি এক বাড়ীতে ক্লিনারের কাজ করছে।'

'কোন বাফেট? যে মেলিন্ডা-গেট ফাউন্ডেশনে কত বিলিয়ন না মিলিয়ন ডলার যেন দান করেছে, সেই কি?'
'হ্যা, সেই বাফেটই, মজার কান্ড যাদের বাড়ীঘর মেয়েটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তারা বাফেটের মতো ততো ধনীও নয়।'

'মেয়েটি নিশ্চয় বাফেটের উপর মহা বিরক্ত, তাই না?'
'আমিও ভেবেছিলাম তাই তবে, আসলে তা নয়। নাতনী বললো বাফেটের সম্পদ যদি বিশাল জনগোষ্ঠীর উপকার করে, তবে তাই হওয়া উচিত। ও বেচারী কৃতজ্ঞ যে তার নানা বাফেট সাহেব তার পড়াশোনার খরচ দিয়েছেন।'

এইবার সুস্মী আন্দোলিত হল। তারপরে কিছুটা সময় ভেবে নিয়ে আশ্চর্য কথা বললো সে
'জানো, এখন মনে হচ্ছে আসলেও কাজ করেই বড় হওয়া উচিত। জন্তু-জানোয়ারের সাথে মানুষের তফাৎ শ্রমে। পশুরা কাড়াকাড়ি, মারামারি করে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, আর মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে, উন্নত করেছে তার শ্রম। ছোটবেলা থেকেই শ্রমে অভ্যস্ত হওয়া ভাল।'

ভিনদেশের হাওয়া বিরাট পরিবর্তন এনে দিল সুস্মীর চিন্তাচেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। তারপরও সে চিন্তা করলো যে, ভিন্‌দেশের ভিনসংস্কৃতির ততোটুকুই সে গ্রহণ করতে রাজী যতটুকুতে কারও কোন ক্ষতি না হয়। অন্যের ভালটুকু গ্রহণ করলে কেউ তার নিজস্বতা হারাবে না নিশ্চয়।